আল ফীল

১০৫

নামকরণ

প্রথম আয়াতের আসহাবিল ফীল (اَصْحٰبِ الْفِيْلِ) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত। এর ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রাখলে মক্কা মু'আযযমায় ইসলামের প্রথম যুগে এটি নাযিল হয় বলে মনে হবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এর আগে সূরা বুরুজের ৪ টীকায় উল্লেখ করে এসেছি, ইয়ামনের ইহুদী শাসক যুনুওয়াস নাজরানে ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর যে জুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেবার জন্য হাবশার (বর্তমান ইথিয়পিয়া) খৃষ্টীয় শাসনকর্তা ইয়ামন আক্রমণ করে হিম্‌ইয়ারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। ৫২৫ খৃষ্টাব্দে এই সমগ্র এলাকাটিতে হাবশার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আসলে কনস্টান্টিনোপলের রোমীয় শাসনকর্তা ও হাবশার শাসকের পারস্পরিক সহযোগিতায় এই সমগ্র অভিযান পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ সে সময় হাবশার শাসকদের কাছে কোন উল্লেখযোগ্য নৌবহর ছিল না। রোমীয়রা এ নৌবহর সরবরাহ করে। এর মাধ্যমে হাবশা তার ৭০ হাজার সৈন্য ইয়ামন উপকূলে নামিয়ে দেয়। পরবর্তী বিষয়গুলো অনুধাবন করার জন্য শুরুতেই জেনে নেয়া উচিত যে, নিছক ধর্মীয় আবেগ তাড়িত হয়ে এসব কিছু করা হয়নি। বরং এসবের পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও সক্রিয় ছিল। বরং সম্ভবত সেগুলোই এর মূলে আসল প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল এবং খৃষ্টান মজলুমদের খুনের বদলা নেবার ব্যাপারটি একটি বাহানাবাজী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আসলে সেকালে পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ ও রোম অধিকৃত এলাকার মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তার ওপর আরবরা শত শত বছর থেকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে চলে আসছিল। রোমান শাসকরা মিসর ও সিরিয়া দখল করার পর থেকেই এই ব্যবসার ওপর থেকে আরবদের আধিপত্য বিলুপ্ত করে একে পুরোপুরি নিজেদের কর্তৃত্বাধীন করতে চাইছিল। কেননা মাঝখান থেকে আরব ব্যবসায়ীদেরকে হটিয়ে দিতে পারলে এর পুরো মুনাফা তারা সরাসরি নিজেরা লাভ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে খৃষ্টপূর্ব ২৪ বা ২৫ অব্দে কাইজার আগাষ্টাস রোমান জেনারেল ইলিয়াস গালুসের (Aelius Gallus) নেতৃত্বে একটি বিরাট সেনাদল আরবের পশ্চিম

উপকূলে নামিয়ে দেয়। দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমুদ্রপথ অধিকার করে নেয়াই ছিল এর লক্ষ। (তাফহীমুল কুরআনের সূরা আনফালের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এ বাণিজ্য পথের নকশা পেশ করেছি।) কিন্তু আরবের চরম প্রতিকূল ভৌগলিক অবস্থা ও পরিবেশ এ অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়। এরপর রোমানরা লোহিত সাগরে তাদের নৌবহর স্থাপন করে। এর ফলে সমুদ্র পথে আরবদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের ব্যবসার জন্য কেবলমাত্র স্থলপথ উন্মুক্ত থেকে যায়। এই স্থলপথটি দখল করে নেবার জন্য তারা হাবশার খৃষ্টান সরকারের সাথে চক্রান্ত করে এবং সামুদ্রিক নৌবহরের সহায়তায় তাকে ইয়ামনের ওপর কর্তৃত্ব দান করে।

ইয়ামন আক্রমণকারী হাবশী সেনাদল সম্পর্কে আরব ঐতিহাসিকগণ যে বিবরণ পেশ করেছেন তাতে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক হাফেজ ইবনে কাসীর লিখেছেন, এ সেনাদল পরিচালিত হয়েছিল দু'জন সেনাপতির অধীনে। তাদের একজন ছিল আরইয়াত এবং অন্যজন আবরাহা। অন্যদিকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে আরইয়াত ছিল এই সেনাবাহিনীর সেনাপতি এবং আবরাহা ছিল এর একজন সদস্য। এরপর এ দু'জন ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পরে আরইয়াত ও আবরাহার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। যুদ্ধে আরইয়াতের মৃত্যু হয়। আবরাহা ইয়ামন দখল করে। তারপর তাকে হাবশার অধীনে ইয়ামনের গভর্ণর নিযুক্ত করার ব্যাপারে সে হাবশা সম্রাটকে সম্মত করতে সক্ষম হয়। বিপরীত পক্ষে গ্রীক ও সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন বিবরণ পেশ করেছেন। তাদের বর্ণনা মতে, ইয়ামন জয় করার পরে হাবশী সৈন্যরা যখন প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী ইয়ামনী সরদারদেরকে একের পর এক হত্যা করে চলছিল তখন তাদের "আস্ সুমাইফি আশ্ওয়া" যাকে গ্রীক ঐতিহাসিকরা বলেছেন Esymphaeus নামক একজন সরদার হাবশীদের আনুগত্য স্বীকার করে জিজিয়া দেবার অংগীকার করে এবং হাবশা সম্রাটের কাছ থেকে ইয়ামনের গভর্ণর হবার পরোয়ানা হাসিল করে কিন্তু হাবশী সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। তারা আবরাহাকে তার জায়গায় গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত করে। আবরাহা ছিল হাবশার আদুলিস বন্দরের একজন গ্রীক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে সে ইয়ামন দখলকারী হাবশী সেনাদলে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। হাবশা সম্রাট তাকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠায়। কিন্তু এই সেনাদল হয় তার পক্ষে যোগ দেয় অথবা সে এই সেনাদলকে পরাজিত করে। অবশেষে হাবশা সম্রাটের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী তাকে ইয়ামনে নিজের গভর্ণর হিসেবে স্বীকার করে নেয়। (গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তার নাম বলেছেন আবরামিস (Abrames) এবং সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ তাকে আবরাহাম (Abraham) নামে উল্লেখ করেছেন। আবরাহা সম্ভবত এরই হাবশী উচ্চারণ। কারণ আরবীতে তো এর উচ্চারণ ইবরাহীম।)

এ ব্যক্তি ধীরে ইয়ামনের স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসে। তবে নামকাওয়াস্তে হাবশা সম্রাটের প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছিল এবং নিজের নামের সাথে সম্রাট প্রতিনিধি লিখতো। তার প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছিল। একটি ব্যাপার থেকে এ সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে সদ্দে মাআরিব–এর সংস্কার কাজ শেষ করে সে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসবে রোমের কাইজার,

ইরানের বাদশাহ, হীরার বাদশাহ এবং গাস্সানের বাদশাহর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। সদ্দে মাআরিবে আবরাহা স্থাপিত শিলালিপিতে এ সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা সংরক্ষিত রয়েছে। এই শিলালিপি আজো অক্ষুণ্ন রয়েছে। গ্লীসার (Glaser) তার গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা ৩৭ টীকা)।

এই অভিযান শুরুর গোড়াতেই রোমান সাম্রাজ্য ও তার মিত্র হাবশী খৃষ্টানদের সামনে যে উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল ইয়ামনে নিজের কর্তৃত্ব পুরোপুরি মজবুত করার পর আবরাহা সেই উদ্দেশ্য সফল করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে আরবে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করা এবং অন্যদিকে আরবদের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তাকে পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে আসা। ইরানের সাসানী সাম্রাজ্যের সাথে রোমানদের কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বের ফলে প্রাচ্য দেশে রোমানদের ব্যবসার অন্যান্য সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে এর প্রয়োজন আরো বেশী বেড়ে যায়।

এ উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়ামনের রাজধানী 'সান্‌আ'য় একটি বিশাল গীর্জা নির্মাণ করে। আরব ঐতিহাসিকগণ একে 'আল কালীস' বা 'আল কুলীস' অথবা 'আল কুল্লাইস' নামে উল্লেখ করেছেন। এটি গ্রীক Ekklesia শব্দের আরবীকরণ। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, একাজটি সম্পন্ন করার পর সে হাবশার বাদশাহকে লিখে জানায়, আমি আরবদের হজ্জকে মক্কার কা'বার পরিবর্তে সানআর এ গীর্জার দিকে ফিরিয়ে না দিয়ে ক্ষান্ত হবো না।* ইবনে কাসীর লিখেছেন, সে ইয়ামনে প্রকাশ্যে নিজের এই সংকল্পের কথা প্রকাশ করে এবং চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেয়। আমাদের মতে তার এ ধরনের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর ফলে আরবরা ক্রুদ্ধ হয়ে এমন কোন কাজ করে বসবে যাকে বাহানা বানিয়ে সে মক্কা আক্রমণ করে কাবাঘর ধ্বংস করে দেবার সুযোগ লাভ করবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তার এ ধরনের ঘোষণায় ক্রুদ্ধ হয়ে জনৈক আরব কোন প্রকারে তার গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে মল ত্যাগ করে। ইবনে কাসীর বলেন, এ কাজটি করেছিল একজন কুরাইশী। অন্যদিকে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের বর্ণনা মতে, কয়েকজন কুরাইশ যুবক গিয়ে সেই গীর্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এর মধ্য থেকে যে কোন একটি ঘটনাই যদি সত্যি সত্যিই ঘটে থাকে তাহলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ আবরাহার এ ঘোষণাটি ছিল নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এ কারণে প্রাচীন জাহেলী যুগের কোন আরব বা কুরাইশীর অথবা কয়েকজন কুরাইশী যুবকের পক্ষে উত্তেজিত হয়ে গীর্জাকে নাপাক করা অথবা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া কোন অস্বাভাবিক বা দুর্বোধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আবরাহার নিজের পক্ষেও নিজের কোন লোক লাগিয়ে গোপনে গোপনে এই ধরনের কোন কাণ্ড করে ফেলাটাও অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় না। কারণ সে এভাবে মক্কা আক্রমণ করার বাহানা সৃষ্টি

* ইয়ামনের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করার পর খৃষ্টানরা মক্কার কা'বাঘরের মোকাবিলায় দ্বিতীয় একটি কা'বা তৈরি করার এবং সমগ্র আরবে তাকে কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নাজরানেও একটি কা'বা নির্মাণ করেছিল। সূরা বুরুজের ৪ টীকায় এর আলোচনা এসেছে।

করতে এবং কুরাইশদেরকে ধ্বংস ও সমগ্র আরববাসীকে ভীত–সন্ত্রস্ত করে দিয়ে নিজের উভয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে পারবে বলে মনে করছিল। মোটকথা দু'টি অবস্থার মধ্য থেকে যেকোন একটিই সঠিক হোক না কেন, আবরাহার কাছে যখন এ রিপোর্ট পৌছল যে, কাবার ভক্ত অনুরক্তরা তার গীর্জার অবমাননা করেছে তখন সে কসম খেয়ে বসে, কা'বাকে গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি স্থির হয়ে বসবো না।

তারপর ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে সে ৬০ হাজার পদাতিক, ১৩টি হাতি (অন্য বর্ণনা মতে ৯টি হাতি) সহকারে মক্কার পথে রওয়ানা হয়। পথে প্রথমে যু–নফর নামক ইয়ামনের একজন সরদার আরবদের একটি সেনাদল সংগ্রহ করে তাকে বাধা দেয়। কিন্তু যুদ্ধে সে পরাজিত ও ধৃত হয়। তারপর খাশ'আম এলাকায় নুফাইল ইবনে হাবীব খাশ'আমী তার গোত্রের লোকদের নিয়ে তার পথ রোধ করে। কিন্তু সেও পরাজিত ও গ্রেফতার হয়ে যায়। সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আবরাহার সেনাদলের পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ সেনাদল তায়েফের নিকটবর্তী হলে বনু সকীফ অনুভব করে এত বড় শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই এবং এই সংগে তারা এ আশংকোও করতে থাকে যে, হয়তো তাদের লাত দেবতার মন্দিরও তারা ভেঙ্গে ফেলবে। ফলে তাদের সরদার মাসউদ একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাকে বলে, আপনি যে উপাসনালয়টি ভাঙতে এসেছেন আমাদের এ মন্দিরটি সে উপাসনালয় নয়। সেটি মক্কায় অবস্থিত। কাজেই আপনি আমাদেরটায় হাত দেবেন না। আমরা মক্কার পথ দেখাবার জন্য আপনাকে পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আবরাহা তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ফলে বনু সাকীফ আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে তার সাথে দিয়ে দেয়। মক্কা পৌছুতে যখন আর মাত্র তিন ক্রোশ পথ বাকি তখন আল মাগাম্মাস বা আল মুগাম্মিস নামক স্থানে পৌছে আবু রিগাল মারা যায়। আরবরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার কবরে পাথর মেরে এসেছে। বনী সাকীফকেও তারা বছরের পর বছর ধরে এই বলে ধিক্কার দিয়ে এসেছে। —তোমরা লাতের মন্দির বাঁচাতে গিয়ে আল্লাহর ঘরের ওপর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছো।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, আল মাগাম্মেস থেকে আবরাহা তার অগ্রবাহিনীকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। তারা তিহামার অধিবাসীদের ও কুরাইশদের উট, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বহু পালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিবেরও দু'শো উট ছিল। এরপর সে মক্কাবাসীদের কাছে নিজের একজন দূতকে পাঠায়। তার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের কাছে এই মর্মে বাণী পাঠায় ঃ আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমি এসেছি শুধুমাত্র এই ঘরটি (কাবা) ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে। যদি তোমরা যুদ্ধ না করো তাহলে তোমাদের প্রাণ ও ধন–সম্পত্তির কোন ক্ষতি আমি করবো না। তাছাড়া তার এক দূতকেও মক্কাবাসীদের কাছে পাঠায়। মক্কাবাসীরা যদি তার সাথে কথা বলতে চায় তাহলে তাদের সরদারকে তার কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। আবদুল মুত্তালিব তখন ছিলেন মক্কার সবচেয়ে বড় সরদার। দূত তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আবরাহার পয়গাম তাঁর কাছে পৌছিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আবরাহার সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। এটা আল্লাহর ঘর তিনি চাইলে তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। দূত বলে, আপনি আমার সাথে

আবরাহার কাছে চলুন। তিনি সম্মত হন এবং দূতের সাথে আবরাহার কাছে যান। তিনি এতই সুশ্রী, আকর্ষণীয় ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আবরাহা তাকে দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সে সিংহাসন থেকে নেমে এসে নিজে তাঁর কাছে বসে পড়ে। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি চান? তিনি বলেন, আমার যে উটগুলো ধরে নেয়া হয়েছে সেগুলো আমাকে ফেরত দেয়া হোক। আবরাহা বলল, আপনাকে দেখে তো আমি বড়ই প্রভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নিজের উটের দাবী জানাচ্ছেন, অথচ এই যে ঘরটা আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মের কেন্দ্র সে সম্পর্কে কিছুই বলছেন না, আপনার এ বক্তব্য আপনাকে আমার দৃষ্টিতে মর্যাদাহীন করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি তো কেবল আমার উটের মালিক এবং সেগুলোর জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আর এই ঘর। এর একজন রব, মালিক ও প্রভু আছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আবরাহা জবাব দেয়, তিনি একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, এ ব্যাপারে আপনি জানেন ও তিনি জানেন। একথা বলে তিনি সেখান থেকে উঠে পড়েন। আবরাহা তাঁকে তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দেয়।

ইবনে আব্বাস (রা) ভিন্ন ধরনের বর্ণনা পেশ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় উট দাবীর কোন কথা নেই। আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, আবু নু'আইম ও বাইহাকী তাঁর থেকে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেন, আবরাহা আসসিফাই (আরাফাত ও তায়েফের পাহাড়গুলোর মধ্যে হারম শরীফের সীমানার কাছাকাছি একটি স্থান) পৌঁছে গেলে আবদুল মুত্তালিব নিজেই তার কাছে যান এবং তাকে বলেন, আপনার এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল? আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকলে আমাদের কাছে বলে পাঠাতেন। আমরা নিজেরাই সে জিনিস নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছে যেতাম। জবাবে সে বলে, আমি শুনেছি, এটি শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর। আমি এর শান্তি ও নিরাপত্তা খতম করতে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব বলেন, এটি আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত তিনি কাউকে এর ওপর চেপে বসতে দেননি। আবরাহা জবাব দেয়, আমি একে বিধ্বস্ত না করে এখান থেকে সরে যাবো না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে যান। কিন্তু আবরাহা অস্বীকার করে। আবদুল মুত্তালিবকে পেছনে রেখে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

উভয় বর্ণনার এ বিভিন্নতাকে যদি আমরা যথাস্থানে রেখে দিই এবং এদের মধ্য থেকে একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য না দিই তাহলে যে ঘটনাটিই ঘটুক না কেন আমাদের কাছে একটি জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সেটি হচ্ছে, মক্কা ও তার চারপাশের গোত্রগুলো এতবড় সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করে কাবাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখতো না। কাজেই একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কুরাইশরা তাদেরকে বাধা দেবার চেষ্টাই করেনি। কুরাইশরা তো আহযাবের যুদ্ধের সময় মুশরিক ও ইহুদি গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে বড় জোর দশ বারো হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। কাজেই তারা ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবিলা করতো কিভাবে?

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আবরাহার সেনাদলের কাছ থেকে ফিরে এসে আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদেরকে বলেন, নিজেদের পরিবার পরিজনদের নিয়ে পাহাড়ের ওপর চলে যাও, এভাবে তারা ব্যাপক গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। তারপর তিনি ও কুরাইশদের কয়েকজন সরদার হারম শরীফে হাযির হয়ে যান। তারা কাবার দরজার কড়া

ধরে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করতে থাকেন যে, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর খাদেমদের হেফাজত করেন। সে সময় কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। কিন্তু এই সংকটকালে তারা সবাই এই মূর্তিগুলোর কথা ভুলে যায়। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য হাত ওঠায়। ইতিহাসের বইগুলোতে তাদের প্রার্থনা বাণী উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে আবদুল মুত্তালিবের নিম্নোক্ত কবিতাসমূহ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

لاَ هُمَّ ان العبد يمنع رحله فامنع حلالك

"হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘর রক্ষা করে
তুমিও তোমার ঘর রক্ষা করো।"

لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك

"আগামীকাল তাদের ক্রুশ ও তাদের কৌশল যেন
তোমার কৌশলের ওপর বিজয় লাভ না করে।"

ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر مابدالك

"যদি তুমি ছেড়ে দিতে চাও তাদেরকে ও আমাদের কিবলাহকে
তাহলে তাই করো যা তুমি চাও।"

সুহাইলী 'রওযুল উনুফ' গ্রন্থে এ প্রসংগে নিম্নোক্ত কবিতাও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

وانصرنا على ال الصليب وعابديه اليوم الك

"ক্রুশের পরিজন ও তার পূজারীদের মোকাবিলায়
আজ নিজের পরিজনদেরকে সাহায্য করো।"

আবদুল মুত্তালিব দোয়া করতে করতে যে, কবিতাটি পড়েছিলেন ইবনে জারীর সেটিও উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে ঃ

يارب لا ارجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا

ان عدو البيت من عاداكا امنعهم ان يخربوا قراكا

"হে আমার রব! তাদের মোকাবিলায়
তুমি ছাড়া কারো প্রতি আমার আশা নেই,
হে আমার রব! তাদের হাত থেকে
তোমার হারমের হেফাজত করো।
এই ঘরের শত্রু তোমার শত্রু,
তোমার জনপদ ধ্বংস করা থেকে
তাদেরকে বিরত রাখো।"

এ দোয়া করার পর আবদুল মুত্তালিব ও তার সাথিরাও পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরের দিন আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু তার বিশেষ হাতী মাহমুদ ছিল

সবার আগে, সে হঠাৎ বসে পড়ে। কুড়ালের বাঁট দিয়ে তার গায়ে অনেকক্ষণ আঘাত করা হয়। তারপর বারবার অংকুশাঘাত করতে করতে তাকে আহত করে ফেলা হয়। কিন্তু এত বেশী মারপিট ও নির্যাতনের পরেও সে একটুও নড়ে না। তাকে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে মুখ করে চালাবার চেষ্টা করলে সে ছুটতে থাকে কিন্তু মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলে সংগে সংগেই গ্যাট হয়ে বসে পড়ে। কোন রকমে তাকে আর একটুও নড়ানো যায় না।

এ সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঠোঁটে ও পাঞ্জায় পাথর কণা নিয়ে উড়ে আসে। তারা এ সেনাদলের ওপর পাথর বর্ষণ করতে থাকে। যার ওপর পাথর কণা পড়তো তার দেহ সংগে সংগে গলে যেতে থাকতো। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও ইকরামার বর্ণনা মতে, এটা ছিল বসন্ত রোগ এবং আরব দেশে সর্বপ্রথম এ বছরই বসন্ত দেখা যায়। ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে, যার ওপরই পাথর কণা পড়তো তার সারা গায়ে ভীষণ চুলকানি শুরু হতো এবং চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ছিঁড়ে গোশত ঝরে পড়তে থাকতো। ইবনে আব্বাস (রা) আর একটি বর্ণনায় বলেছেন, গোশত ও রক্ত পানির মতো ঝরতে থাকতো এবং হাড় বের হয়ে পড়তো। আবরাহা নিজেও এই অবস্থার সম্মুখীন হয়। তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তো এবং যেখান থেকে এক টুকরো গোশত খসে পড়তো সেখান থেকে রক্ত ও পুঁজ ঝরে পড়তে থাকতো। বিশৃংখলা ও হুড়োহুড়ি ছুটাছুটির মধ্যে তারা ইয়ামনের দিকে পালাতে শুরু করে। খাশ'আম এলাকা থেকে যে নুফাইল ইবনে হাবীব খাশ'আমীকে তারা পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে আসে তাকে খুঁজে পেয়ে সামনে নিয়ে আসা হয় এবং তাকে ফিরে যাবার পথ দেখিয়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু সে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। সে বলে ঃ

اين المفرو الاله الطالب والا شرم المغلوب ليس الغالب

"এখন পালাবার জায়গা কোথায়
যখন আল্লাহ নিজেই করছেন পশ্চাদ্ধাবন?
আর নাককাটা আবরাহা পরাজিত
সে বিজয়ী নয়।"

এই পলায়ন তৎপরতার মধ্যে লোকেরা পথে ঘাটে এখানে সেখানে পড়ে মরতে থাকে। আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন তখনই এক সাথে সবাই মারা যায়নি। বরং কিছু লোক সেখানে মারা পড়ে আর দৌড়াতে দৌড়াতে কিছু লোক পথের ওপর পড়ে যেতে থাকে। এভাবে সারাটা পথে তাদের লাশ বিছিয়ে থাকে। আবরাহাও খাশ্'আম এলাকায় পৌঁছে মারা যায়।*

* মহান আল্লাহ হাবশীদেরকে শুধুমাত্র শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি বরং তিন চার বছরের মধ্যে ইয়ামনের ওপর থেকে হাবশী কর্তৃত্ব পুরোপুরি খতম করে দেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হাতির ঘটনার পর ইয়ামনে তাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে ইয়ামনী সরদাররা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়াতে থাকে। সাইফ ইবনে যী ইয়াযান নামক একজন ইয়ামনী সরদার ইরানের বাদশাহর কাছ থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে। ছয়টি জাহাজে চড়ে ইরানের এক হাজার সৈন্য ইয়ামনে অবতরণ করে। হাবশী শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য এ এক হাজার সৈন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। এটা ৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

মুয্দালিফা ও মিনার মধ্যে অবস্থিত মহাসাব উপত্যকার সন্নিকটে মুহাস্সির নামক স্থানে এ ঘটনাটি ঘটে। ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের যে ঘটনা ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে চলেন তখন মুহাস্সির উপত্যকায় তিনি চলার গতি দ্রুত করে দেন। ইমাম নববী এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আসহাবে ফীলের ঘটনা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ জায়গাটা দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়াটাই সুন্নাত। মুআত্তায় ইমাম মালিক রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুযদালিফার সমগ্র এলাকাটাই অবস্থান স্থল। তবে মুহাস্সির উপত্যকায় অবস্থান না করা উচিত। ইবনে ইসহাক নুফাইল ইবনে হাবীবের যেসব কবিতা উদ্ধৃত করেছেন তাতে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ এভাবে পেশ করা হয়েছে ঃ

رُدَيـنـةُ لـو رأيـتِ ولا تَـريـه لدٰى جنب المحصَّب مارأينا

حمدت اللّٰه اذا بصرت طيرًا وخفت حجارة تلقى علينا

وكل القوم يسئال عن نفيل كأنّ على للجشان دَينا

"হায়, যদি তুমি দেখতে হে রুদাইনা।
তবে তুমি দেখতে পাবে না যা কিছু দেখেছি আমি
মুহাস্সাব উপত্যকার কাছে।
আল্লাহর শোকর করেছি আমি
যখন দেখেছি পাখিদেরকে
শংকিত হচ্ছিলাম বুঝিবা পাথর ফেলে আমাদের ওপরও।
নুফাইলের সন্ধানে ফিরছিল তাদের সবাই
আমি যেন হাবশীদের কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা।"

এটা একটা মস্তবড় ঘটনা ছিল। সমগ্র আরবে এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক কবি এ নিয়ে কবিতা লেখেন। এ সমস্ত কবিতার একক বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, সবখানেই একে আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কোন একটি কবিতাতেই ইশারা–ইংগিতেও একথা বলা হয়নি যে, কা'বার অভ্যন্তরে রক্ষিত যেসব মূর্তির পূজা করা হতো তাদের কারো এতে সামান্যতম হাত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে যিবা'রা বলেন ঃ

ستّون الفالم يؤبوا ارضهم ولم يعش بعد الاياب سقيمها

كانت بها عادوجرهم قبلهم واللّٰه من فوق العباد يقيمها

"ষাট হাজার ছিল তারা
ফিরতে পারেনি নিজেদের স্বদেশ ভূমিতে,
আর ফেরার পরে তাদের রুগ্ন ব্যক্তি (আবরাহা) জীবিত থাকেনি।
এখানে তাদের পূর্বে ছিল আদ ও জুরহুম,
আর আল্লাহ বান্দাদের ওপর রয়েছেন,
তাদেরকে রেখেছেন তিনি প্রতিষ্ঠিত করে।"

আবু কায়েস ইবনে আস্‌লাত তার কবিতায় বলেন ঃ

فقوموا فصلوا ربكم وتمسّحوا   بار كان هٰذا البيت بين الاخاشب
فلما اتاكم نصرذى العرشى ردّهم   جنود المليك بين ساف وحاصب

"ওঠো, তোমার রবের ইবাদাত করো,
এবং মক্কা ও মিনার পাহাড়গুলোর মাঝখানে
বাইতুল্লার কোণগুলো স্পর্শ করো।
আরশবাসীদের সাহায্য যখন পৌঁছুল তোমাদের কাছে
তখন সেই বাদশাহর সেনাবাহিনী
তাদেরকে ফিরিয়ে দিল এমন অবস্থায়–
তাদের কেউ পড়ে ছিল মৃত্তিকার পরে
আর কেউ ছিল প্রস্তরাঘাতে ছিন্নভিন্ন।"

শুধু এখানেই শেষ নয় বরং হযরত উম্মে হানী (রা) ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামের (র) বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কুরাইশরা ১০ বছর (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ৭ বছর) পর্যন্ত এক ও লাশরীক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করেনি। উম্মে হানীর রেওয়ায়াতটি ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে এবং তাবারানী, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী তাদের হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আসাকির হযরত যুবাইরের (রা) বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। খতীব বাগদাদী তার ইতিহাস গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের যে মুরসাল রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

যে বছর এ ঘটনাটি ঘটে, আরববাসীরা সে বছরটিকে 'আমুল ফীল' (হাতির বছর) বলে আখ্যায়িত করে। সেই বছরেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয়। আসহাবে ফীলের ঘটনাটি ঘটে মহররম মাসে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয় রবিউল আউয়াল মাসে। এ বিষয়ে সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক একমত পোষণ করেন। অধিকাংশের মতে, রসূলের (সা) জন্ম হয় হাতির ঘটনার ৫০ দিন পরে।

মূল বক্তব্য

ওপরের যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সূরায় কেন শুধুমাত্র আসহাবে ফীলের ওপর মহান আল্লাহর আযাবের কথা বর্ণনা করেই শেষ করে দেয়া হয়েছে তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। ঘটনা খুব বেশী পুরানো ছিল না। মক্কার সবাই এ ঘটনা জানতো। আরবের লোকেরা সাধারণভাবে এ সম্পর্কে অবহিত ছিল। সমগ্র আরববাসী স্বীকার করতো আবরাহার এ আক্রমণ থেকে কোন দেবতা বা দেবী নয় বরং আল্লাহ কা'বার হেফাজত করেছেন। কুরাইশ সরদাররা আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করেছিল। আবার এ ঘটনা কুরাইশদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত এত বেশী প্রভাবিত করে রেখেছিল যে, তারা সে সময় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করেনি। তাই সূরা ফীলে এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। বরং শুধুমাত্র এ ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। এভাবে স্মরণ করিয়ে দেবার ফলে বিশেষ করে কুরাইশরা এবং সাধারণভাবে সমগ্র আরববাসী মনে মনে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের দিকে আহবান জানাচ্ছেন সেটি অন্যান্য মাবুদদেরকে ত্যাগ করে একমাত্র লাশরীক আল্লাহর ইবাদাত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া তারা একথাটিও ভেবে দেখার সুযোগ পাবে যে, এ হকের দাওয়াত যদি তারা বল প্রয়োগ করে দমন করতে চায় তাহলে যে আল্লাহ আসহাবে ফীলকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন তারা তাঁরই ক্রোধের শিকার হবে।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيلِ ۝١ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝٢ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝٣ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝٥

তুমি কি দেখনি[১] তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কি করেছেন?[২] তিনি কি তাদের কৌশল[৩] ব্যর্থ করে দেননি?[৪] আর তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান,[৫] যারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল পোড়া মাটির পাথর।[৬] তারপর তাদের অবস্থা করে দেন পশুর খাওয়া ভূষির মতো।[৭]

১. বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু মূলত এখানে শুধু কুরাইশদেরকেই নয় বরং সমগ্র আরববাসীকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তারা এই সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। কুরআন মজীদের বহু স্থানে 'আলাম তারা' (তুমি কি দেখনি?) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নয় বরং সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করাই উদ্দেশ্য। (উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দেখুন ঃ ইবরাহীম ১৯ আয়াত, আল হাজ্জ ১৮ ও ৬৫ আয়াত, আন নূর ৪৩ আয়াত, লোকমান ২৯ ও ৩১ আয়াত, ফাতের ২৭ আয়াত এবং আয্ যুমার ২১ আয়াত) তাছাড়া দেখা শব্দটি এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কায় ও তার আশেপাশে এবং আরবের বিস্তৃত এলাকায় এ আসহাবে ফীলের ঘটনাটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে এ ধরনের বহু লোক সে সময় জীবিত ছিল। কারণ তখনো এই ঘটনার পর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যায়নি। লোক মুখে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ সরাসরি এত বেশী বেশী সূত্রে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যার ফলে এটা প্রায় সব লোকেরই চোখে দেখা ঘটনার পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল।

২. এই হাতিওয়ালা কারা ছিল, কোথায় থেকে এসেছিল, কি উদ্দেশ্যে এসেছিল এসব কথা আল্লাহ এখানে বলছেন না। কারণ এগুলো সবাই জানতো।

৩. মূলে কাইদা (كَيْد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি করবার জন্য গোপন কৌশল অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে গোপন কি ছিল? ষাট হাজার লোকের একটি সেনাবাহিনী কয়েকটি হাতি নিয়ে প্রকাশ্যে ইয়ামন থেকে মক্কায় আসে। তারা যে কা'বা শরীফ ভেঙ্গে ফেলতে এসেছে, একথাও তারা গোপন করেনি। কাজেই এ কৌশলটি গোপন ছিল না। তবে হাবশীরা কা'বা ভেঙে ফেলে কুরাইশদেরকে বিধ্বস্ত ও পর্যদস্ত করে এবং এভাবে সমগ্র আরববাসীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথ আরবদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছিল। এটা ছিল তাদের মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যটিকে তারা গোপন করে রাখে। অন্যদিকে তারা প্রকাশ করতে থাকে কয়েকজন আরব তাদের গীর্জার যে অবমাননা করেছে, কা'বা শরীফ ভেঙে ফেলে তারা তার প্রতিশোধ নিতে চায়।

৪. মূলে বলা হয়েছে فِىْ تَضْلِيْلٍ অর্থাৎ তাদের কৌশলকে তিনি ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী কৌশলকে ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করার মানে হয় তাকে নষ্ট ও বিধ্বস্ত করে দেয়া অথবা নিজের উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাকে ব্যর্থ করে দেয়া। যেমন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তির তীর লক্ষ ভ্রষ্ট হয়েছে, তার সব প্রচেষ্টা ও কলাকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। কুরআন মজীদের এক জায়গায় বলা হয়েছে وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ "কিন্তু কাফেরদের কলাকৌশল ব্যর্থ হয়েছে।" (আল মু'মিন ২৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে : وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ "আর আল্লাহ খেয়ানতকারীদের কৌশলকে সফলতার দ্বারে পৌঁছিয়ে দেন না।" (ইউসুফ ৫২) আরববাসীরা ইমরাউল কায়েসকে اَلْمَلِكُ الضِّلِّيْلُ "বিনষ্টকারী বাদশাহ" বলতো। কারণ সে তার বাপের কাছ থেকে পাওয়া বাদশাহী হারিয়ে ফেলেছিল।

৫. মূলে বলা হয়েছে طَيْرًا اَبَابِيْلَ আরবীতে আবাবীল মানে হচ্ছে, বহু ও বিভিন্ন দল যারা একের পর এক বিভিন্ন দিক থেকে আসে। তারা মানুষও হতে পারে আবার পশুও হতে পারে। ইকরামা ও কাতাদাহ বলেন, লোহিত সাগরের দিক থেকে এ পাখিরা দলে দলে আসে। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও ইকরামা বলেন, এ ধরনের পাখি এর আগে কখনো দেখা যায়নি এবং এর পরেও দেখা যায়নি। এগুলো নজদ, হেজায, তেহামা বা লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী উপকূল এলাকার পাখি ছিল না। ইবনে আব্বাস বলেন, তাদের চঞ্চু ছিল পাখিদের মতো এবং পাঞ্জা কুকুরের মতো। ইকরামার বর্ণনা মতে তাদের মাথা ছিল শিকারী পাখীর মাথার মত। প্রায় সকল বর্ণনাকারীর সর্বসম্মত বর্ণনা হচ্ছে, প্রত্যেকটি পাখির ঠোঁটে ছিল একটি করে পাথরের কুচি এবং পায়ে ছিল দু'টি করে পাথরের কুচি। মক্কার অনেক লোকের কাছে এই পাথর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। আবু নু'আইম নওফাল ইবনে আবী মু'আবীয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, আসহাবে ফীলের ওপর যে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল আমি তা দেখেছি। সেগুলোর এক একটি ছিল ছোট মটর দানার সমান। গায়ের রং ছিল লাল কালচে। আবু নু'আইম ইবনে আব্বাসের যে রওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল চিলগুজার* সমান। অন্যদিকে ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা মতে, সেগুলো ছিল ছাগলের লেদীর সমান। মোটকথা, এসবগুলো পাথর সমান মাপের ছিল না। অবশ্যি কিছু না কিছু পার্থক্য ছিল।

* চিলগুজা চীনাবাদাম জাতীয় এক ধরনের শুকনা ফল। লম্বায় ও চওড়ায় একটি চীনাবাদামের প্রায় সমান।

৬. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ অর্থাৎ সিজ্জীল ধরনের পাথর। ইবনে আব্বাস বলেন, এ শব্দটি মূলত ফারসীর "সংগ" ও "গীল" শব্দ দু'টির আরবী করণ।* এর অর্থ এমন পাথর যা কাদা মাটি থেকে তৈরি এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়েছে। কুরআন মজীদ থেকেও এই অর্থের সত্যতা প্রমাণ হয়। সূরা হূদের ৮২ ও সূরা হুজুরাতের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে, লূত জাতির ওপর সিজ্জীল ধরনের পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং এই পাথর সম্পর্কে সূরা যারিয়াতের ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল মাটির পাথর অর্থাৎ কাদামাটি থেকে সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল।

মাওলানা হামীদুদ্দিন ফারাহী মরহুম ও মগফুর বর্তমান যুগে কুরআনের অর্থ বর্ণনা ও গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি এ আয়াতে "তারমীহিম" (তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল) শব্দের কর্তা হিসেবে মক্কাবাসী ও অন্যান্য আরববাসীদেরকে চিহ্নিত করেছেন। "আলাম তারা" (তুমি কি দেখনি) বাক্যাংশেও তাঁর মতে এদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। পাখিদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা পাথর নিক্ষেপ করছিল না বরং তারা এসেছিল আসহাবে ফীলের লাশগুলি খেয়ে ফেলতে। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তার নির্যাস হচ্ছে এই যে, আবদুল মুত্তালিবের আবরাহার কাছে গিয়ে কা'বার পরিবর্তে নিজে উট ফেরত নেবার জন্য দাবী জানানোর ব্যাপারটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে কুরাইশরা এবং অন্যান্য যেসব লোকেরা হজ্জের জন্য এসেছিল তারা হানাদার সেনাদলের কোন মোকাবেলা না করে কাবাঘরকে তাদের করুণা ও মেহেরবানির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পাহাড়ের ওপর গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করবে, একথাও দুর্বোধ্য মনে হয়। তাই তাঁর মতে আসল ঘটনা হচ্ছে, আরবরা আবরাহার সেনাদলের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহ পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত করে এই সেনাদলকে বিধ্বস্ত করেন। তারপর তাদের লাশ খেয়ে ফেলার জন্য পাখি পাঠান। কিন্তু ভূমিকায় আমরা বলেছি, আবদুল মুত্তালিব তার উট দাবী করতে গিয়েছিলেন, রেওয়ায়াতে কেবল একথাই বলা হয়নি। বরং রেওয়ায়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটের দাবীই জানাননি এবং আবরাহাকে তিনি কাবা আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টাও করেছিলেন। আমরা একথাও বলেছি, সমস্ত নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আবরাহা মহররম মাসে এসেছিল। তখন হাজীরা ফিরে যাচ্ছিল আর একথাও আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে, ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করা কুরাইশদের ও তাদের আশেপাশের গোত্রগুলোর সামর্থের বাইরে ছিল। আহযাব যুদ্ধের সময় বিরাট ঢাক ঢোল পিটিয়ে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে আরব মুশরিক ও ইহুদি গোত্রগুলোর যে সেনাদল তারা এনেছিল তার সংখ্যা দশ বারো হাজারের বেশী ছিল না। কাজেই ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করার সাহস তারা কেমন করে করতে পারতো? তবুও এ সমস্ত যুক্তি বাদ দিয়ে যদি শুধু মাত্র সূরা ফীলের বাক্য বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে এ ব্যাখ্যা তার বিরোধী প্রমাণিত হয়। আরবরা পাথর মারে এবং তাতে আসহাবে ফীল মরে ছাতু হয়ে যায় আর তারপর পাখিরা আসে তাদের লাশ খাবার জন্য, ঘটনা যদি এমনি ধরা হতো তাহলে বাক্য বিন্যাস হতো নিম্নরূপভাবে ঃ

* সংগ মানে পাথর এবং গীল মানে কাদা।–অনুবাদক

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلٍ ـ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ ـ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ـ

(তোমরা তাদেরকে মারছিলে পোড়া মাটির পাথর। তারপর আল্লাহ তাদেরকে করে দিলেন ভুক্ত ভূষির মতো। আর আল্লাহ তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন) কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, প্রথমে আল্লাহ পাখির ঝাঁক পাঠাবার কথা জানালেন তারপর তার সাথে সাথেই বললেন ঃ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ অর্থাৎ যারা তাদেরকে পোড়া মাটির তৈরী পাথরের কুচি দিয়ে মারছিল। সবশেষে বললেন, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ভুক্ত ভূষির মতো করে দিলেন।

৭. আসল শব্দ হচ্ছে, كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ আসফ শব্দ সূরা আর রহমানের ১২ আয়াতে এসেছে ঃ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ "শস্য ভূষি ও চারাওয়ালা।" এ থেকে জানা যায়, আসফ মানে হচ্ছে খোসা, যা শস্য দানার গায়ে লাগানো থাকে এবং কৃষক শস্য দানা বের করে নেবার পর যাকে ফেলে দেয় তারপর পশু তা খেয়েও ফেলে। আবার পশুর চিবানোর সময় কিছু পড়েও যায় এবং তার পায়ের তলায় কিছু পিশেও যায়।